

ପାର୍ଥସାରଥୀ

“ନୀତିରହ” ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଇତିହାସବାଦୀ ବାହନା ମାସିକ ପତ୍ରିକା (୬୭ତମ ବର୍ଷ)

<https://www.parthasarathipatrika.com>



୧୫ତମ ଅନୁର୍ଜନ ଅଂକ୍ଷା

୬୫ ବର୍ଷିକ, ୧୫୦୦ / 24.10.2026

-: ଅଧ୍ୟକ୍ଷ:- ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ

- সূচিপত্র -
(৭৯তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা

আত্ম-কথা

সাধারণ জীবন

রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের তাৎপর্য

ভারত-তীর্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ঝটিকা সফর তিন শহর

হারিয়ে যাওয়া

শুভেচ্ছা

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রীমা

শ্রীমতী যুক্তা চৌধুরী

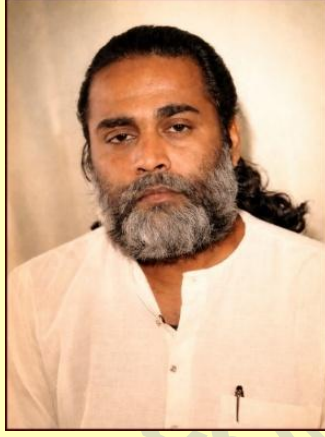
শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

শ্রী অরুণ কুমার ভট্টাচার্য

শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, **PARTHASARATHI** Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: <https://www.parthasarathipatrika.com>

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.



(১০.০৩.১৯২৬ – ১৪.১১.১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

“সহনশীলতা মানুষের প্রকৃষ্ট গুণ। গীতা মানুষকে সহনশীল, আত্মসংযমী ও যোগী হতে বলেছেন। গীতায় মানসিক পবিত্রতার উপর সবচাইতে জোর দেওয়া হয়েছে। গীতায় ত্যাগ ও ভোগ, জ্ঞান ও কর্ম, প্রেম ও ভক্তির মহামিলনে মানবজীবন হয়েছে আদর্শ মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতার জীবন সঙ্গীত শাস্ত্রত সমন্বয় সঙ্গীত। ভ্রাতৃত্ব ও সেবার মধ্য দিয়ে এনে দেয় জীবনে ঐক্যতানের সুর ও গতিময়তা, জীবন হয়ে ওঠে গীতাময়। দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিজীবনে ও সংঘাতময় সমাজজীবনে গীতাই আমাদের এনে দিতে পারে সুখ, শান্তি, আনন্দময় জীবন ও পবিত্রতা।”

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন ছিল ১০ই মার্চ। তাঁর কয়েকদিন আগেই বকুল আমাদের চিরদিনের মত ছেড়ে যায়। বকুলের ঐ আকস্মিক মৃত্যু আমার সমস্ত ভিতরটাকে ওলট পালট করে দেয়। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর পূজার কটা দিন আমাদের কাছে কাটিয়ে গেছে। এবার পূজার সময়ে এসে ঐবিজয়ার দিনটা আমাদের কাছে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে গেল। দুপুরে একঘণ্টার মধ্যে আমার একটা শাড়ীতে ‘ফল’ লাগিয়ে দিল। কতবার করে দিল্লী যাবার নিমন্ত্রণ করে গেল। এবার ছুটিতে বকুলের কাছে দিল্লী যাব ভাবছিলাম। আর যাওয়া হল না। হয়তো বকুলের কথা মনে পড়লে আর কোনও দিনও আমার দিল্লী যাওয়া হবে না। বকুল আমার সন্তানের মতো। প্রায় বাপীর বয়সী। পূজার সময় এসেছিল বলে একটি শাড়ী দিয়েছিলাম। আগের বারও দিয়েছিলাম। বললো, “দিদি বারবার আমাকে দেবেন কেন?” আমি বললাম “তুইতো আমার অনেক ছোট, আমি বড় দিদি, তাই তোর জন্য কিনেছি।” যাবার সময় মীরাকে বলে গেছিলো, “এবার আমি কারও জন্য কিছু আনি আর না আনি শুল্কাদির জন্য কিছু আনবই।” আর সে কোনও দিনও আমার জন্য কিছু আনবে না।

বকুল ছিল মীরার ছোট বোন। সোমার ছোট মাসী। একটি মাত্র মেয়েকে রেখে সে অকালে চলে গেল। বকুলের খবরের পর আমার মাথা আর কাজ করছিলো না। উনুনে রান্না পুড়ে যাচ্ছিলো। হাত থেকে বাসন পড়ে যাচ্ছিলো। গরম রান্নায় হাত পা জ্বলে যাচ্ছিলো। প্রায় তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলাম না। মুখটা কেমন ফুলে গেছিলো। চোখের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। একটু ভয়ই পেলাম।

ওপাশে heart-এর ব্যামো বাঁধিয়ে বসেছিলাম ১৯৮৮ সালে রাস্তায় “মহিলা সমিতির” সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার শত্রুপক্ষের আক্রমণে। আজকাল খবরের কাগজে বড়তলা থানা এলাকার আল্লনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবস্ত্র করে আহত করবার কথা পড়ে ভাবি ভদ্রমহিলা একদিক দিয়ে অন্তত ভাগ্যবতী। তাঁর নিগ্রহ নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা আমাদের বিনা দোষে বউবাজার—সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে ঐ একই ভাবে নিগ্রহ করেছিল তখন তো কোনও বিচার হয়নি। কাউকে থেপ্তার করা হয়নি। মারটা খেয়ে একটা ভালো হয়েছিল। আমাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন নির্ধিকায় বাপীর Divorce-এর পক্ষে রায় দিয়েছিল। ঐ case সে লড়েছিল কিশোর আর আদিত্যদার সহযোগিতায়। Divorce হয়ে গিয়েছিলো। আরও আটমাস পর বাপীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী active ছিল শ্রীলা, কিশোর, শেখর, আদিত্যদা। আদিত্যদার সপরিবারে উপস্থিতি আমাকে অনেক সাহস জুগিয়ে ছিল। বিয়ের পর বাপী বোধহয় কিছু insecurity-তে ভুগছিলো। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হোত। তখন রাগ হলেই কিশোরের বাড়ী ছুটতাম। বাচেল্লী হবার পরও একবার কিশোরের কাছে গেছিলাম। কিশোরের এককথা - “মামীমা আপনি ভালো থাকুন। মামীমা আপনি আনন্দে থাকুন।” আমার মাথায় ঢুকলো ছেলেটা অত অসুস্থ, আবার আমার রাগের বোঝা ওর উপর চাপাই কেন? নিজেকে সংযত করলাম। ছেলের উপর রাগ করে heart-এর ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছিলাম। আমার জন্য ওকে খরচ করতে হবে না। অথচ নিজে কিনে নিতেও রুচিতে বিবেকে বাঁধতো। ফলে দীর্ঘ ছ’মাসের উপর heart-এর ওষুধ খাওয়া হয়নি। ব্যাস! এখন বাপ বাপ করে সেই ওষুধ গিলছি। এখন ছেলেই Cardiologist-এর কাছে নিয়ে গেল। আবার Blood test -- থাইরয়েড আছে কিনা, সোনোগ্রাফি করা, কোনও টিউমার বা কিডনীতে দোষ

আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি Test করতে যাবার আগে শ্রীশ্রীতিকুমারকে বলে গেলাম আমার কার্সিনোমা হলে সহ্য হবে কিন্তু থাইরয়েডের গণ্ডগোল যেন না হয়। আমি জানি আমাদের রিপোর্ট সর্বদা নর্মাল থাকে। ECG বাদে আমারও সব রিপোর্ট নর্মাল। এখন নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছি। Alzolan খেয়ে সকাল সাড়ে আটটাতে উঠি। তারপর নিজের কাজ করি। এর মধ্যে কিশোর মাঝে কদিন শয্যাশায়ী থাকলো, আমি আবার দুদিন থেকে এলাম টালিগঞ্জে। কিশোর ও মলি আমাকে ওদের বাড়ী যাবার জন্য যা বায়না ধরে আমি অস্বীকার করতে পারি না। জানি সবার কাছে ব্যাপারটা একটু নতুন লাগছে। একটু ভাবলে দেখা যাবে কেন আমি ওদের নিরাশ করি না।

এবার আসি শ্রীশ্রীতিকুমারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের বর্ণনায়। নীরেনদা শ্রীশঙ্কিব্রত দাস-কে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সারাদিনে কে কে আসবে, কে কখন আসবে জানি না। কত লোকের খাবার করব হিসেব করতে পারছি না। মীরা নেই— গেছে দিল্লীতে, বকুলের বাড়ীতে। সোমা সব কাজ করতে শিখে গেছে। তবুও ঐটুকু মেয়ের উপর অতবড় দায়িত্বভার দেওয়া যায় না। অনিমাকে গিয়ে ধরলাম। ও বললো, “দাদার জন্য একদিন ছুটি নিতে পারব না? কাল আটটার মধ্যে চলে যাবো।” গীতাদিকে ফোন করেছিলাম। গীতাদির শরীর খারাপ। তাকে ভারী কাজ করতে দেওয়া হয় না। তবুও সে সকালে সোমাকে direction দিতে আসতে রাজী হোল। আর মনু? সে সব কাজ সেরে সংসার সামলে বরকে অফিসে পাঠিয়ে ছেলেকে কলেজে পাঠিয়ে সাড়ে দশটা এগারোটায় কসবা থেকে রওনা হয়। এখানে যথারীতি ১২টার আগে পৌঁছাতে পারে না। এবার মীরার অনুপস্থিতিজনিত পরিস্থিতি আমাকে হতাশ করে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ১৪০১ সনের পরিকল্পনার ছক কষে

নিলাম। সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যাই হোক এমন যখন অবস্থা, টেলিফোন এসেছে মীরা ৮ই মার্চ দিল্লী থেকে রওনা হয়ে ৯ই মার্চ কলকাতা পৌঁছোচ্ছে। আমি গীতাদিকে ফোন করেছিলাম - মীরা এসে যাবে সুতরাং গীতাদিকে তাড়াহুড়ো করে বেশী সকালে আসতে হবে না। যাইহোক ১০ই মার্চ সকাল আটটার মধ্যে শ্রীমতী মীরা দাশ এসে হাজির। সেকেণ্ডের মধ্যে চারখানা ওভেন জ্বলে আমি মাছ, চাটনী ইত্যাদি রান্না করে ফেললাম। মীরা ফ্রায়েড রাইস করলো। সেদিন আবার ছিল শিবরাত্রি। শান্তিদি এখানে এসে উপবাস ভঙ্গ করবেন। আমার শিবদের স্নান করিয়ে রীতিমত চরণামৃত তৈরী করে রাখলাম। সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ছটায় শ্রীশঙ্কর দাস এলেন। সঙ্গে দুজন যজ্ঞবাদক। প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে শুরু করলেন, তারপর ধরলেন - “দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে---” আমার হঠাৎ প্রাণের মধ্যে কেমন দুমড়ে মুচড়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বাপীর ঘরের কোণে অন্ধকারে আশ্রয় নিলাম। দেখলাম আমার সাথে সাথে আরও দু একজনের চোখে জল। শ্রীপ্রীতিকুমার ভীষণ গান ভালোবাসতেন। পার্থসারথি চক্রের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গায়ক গায়িকারা মাতিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি সবার মন জয় করেছিলেন তাঁর নাম “স্বামী শিবানন্দ গিরি।” তিনি প্রয়াত না হলে আমি একবার কেন বারবার তাঁকে আমার এ কুটীরে নিয়ে আসতাম। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। তিনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে অকালে কাছে টেনে নিলেন।

শ্রীশঙ্কর দাস গান ধরতে না ধরতে হঠাৎ লোডশেডিং -- যা কোনও কালে হয় না। দীর্ঘকাল এ অসুবিধা হয়নি। আমাদের জেনারেটর-এর লাইন আছে। দুটি লাইট ও একটি T.V. চলে। বাপী কোথা থেকে এসে মাইক-এর সাথে

জেনারেটর-এর লাইন কানেক্ট করে দিল। গানের আসর জমে উঠেছে। এই সময় একটি অঘটন ঘটলো। খবর এলো আমাদের next door neighbour শ্রীসান্যাল নার্সিং হোমে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমরা কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অত লোক সমবেত হয়েছেন, তার মধ্যে গান বন্ধ করা যাবে কি? ফ্ল্যাটের অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এসে অনুরোধ করলেন অন্ততঃ মাইক-টা বন্ধ করে দিতে। আমরা তাই করলাম। সে যে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা বলা যায় না। তিনি কি অপূর্ব সিলেক্টেড গান গাইছিলেন তা বলবার নয়। আমাদের বাড়ী তাড়াতাড়ি খালি হয়ে গেল। এর মধ্যে প্রয়াত শ্রী সান্যালের দেহ এসে গেল। যেমন লোক ওদের ঘরে ঢুকছে, তেমনি আমাদের বাড়ীতে ঢুকছে ও বেরোচ্ছে। আমাদের যারা সাঁড়িতে যাই-যাই করেও শেষ কথা বলতে গিয়ে দেৱী করছে তাদের উপর আমার রাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মীরা ও কৌশিক রাত্রে থেকে গেল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম মৃতদেহ বেরিয়ে যাবার জন্য। প্রায় রাত দু'টোয় আমরা খাওয়া দাওয়া সারলাম।

এবার আসি মীরার কথায়। মীরার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ১৯৭২ সাল থেকে। কৌশিককে ওর দাদুর হাতে আমিই তুলে দিয়েছিলাম। ম্যাজিক-এর মতো ওর ছোটবেলার সব সিরিয়াস অসুখ দাদু সারিয়ে দিয়েছিলেন। মা হিসেবে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আমরা যখন যেভাবে ডাকি মীরা ছুটে এসেছে।

আমার সংসারে কতগুলি অঘটন ঘটে গেছিলো সেগুলি আমি আজও মনে করলে কষ্ট পাই। শ্রীপ্রীতিকুমার নীলকণ্ঠের মতো সমস্ত গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ করে বিদায় নিয়েছিলেন। সে সব হিসেব দেব কাকে? অবশ্য নীরবতার থেকে বড় কিছু নেই তা সময়ই আমাকে শেখাচ্ছে।

এবার ১০ই মার্চ মীরা যখন শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে দিল্লী থেকে এসে পৌঁছালো এবং সকাল থেকে রাত দু'টো পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেল, আমি মনে মনে তাকে আশীর্বাদ না করে পারলাম না।

এবার আসি আমার শ্রোতা হিসেবে অভিজ্ঞতার কথায়। কেউ কেউ আসেন কথার ঝাঁপি নিয়ে, বলেন – আমি ‘ওনার কাছে’ নিজের জন্য কিছু চাই নি, আমাকে ‘উনি’ সব কথা বলে গেছেন, আমি এই এই দেখতে পাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার খুব হাসি পায়। আমি তো দীর্ঘদিন ধরে পর্দার অন্তরালে ছিলাম। আমি ঘরে ঢুকলে ফিসফিস্ বন্ধ হয়ে যেত। দেখেছি সবই তো, ওই সব তো মনে পড়ে না। আর কত বলব? আমি কিছু কোনও দিন চাইনি যদি কেউ বলেন, তিনি অন্তত স্বর্গে জায়গা পাবেন না। অবশ্য এ’ পৃথিবীতে স্বর্গে যাওয়ার অধিকার আমার একলার আছে বলে শ্রীপ্রীতিকুমারকে বলেছিলাম। তিনি হাসতেন। গীতাদি তাঁর সামনেই বলেছিল, ও বৌদি, তুমি যখন ওখানে একলা থাকবে, বলে উঠবে, “ওগো তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমি আর একা থাকতে পারছি না।” কথাটা সত্যি। একা থাকতে আমার তখন ভালো লাগতো না। এখন লাগে।

আরও একটা ব্যাপারে আমার কিছু বলবার আছে। এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছেলের হাতে। তারা স্বামী-স্ত্রী যথেষ্ট উদার। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের তারা খুব যত্ন করে ও সম্মান দেয়। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। রাত সাড়ে আটটার সময় যদি কোনও ভদ্রলোক এই অঞ্চলে কোনও ব্যক্তিগত কাজে এসে খেজুরে আলাপ করবার জন্য শ্রীপ্রীতিকুমারকে প্রণাম করার বাহানায় ঢুকে পড়েন, আমার এতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। আমি বাড়ীতে না থাকলে আমার পুত্রবধূ অস্বস্তি বোধ করতে পারে। আমি তাকে অসুবিধা ভোগ করবার সুযোগ দেব কেন? কিশোর, অনু আমার

সন্তানতুল্য। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আত্মার সম্পর্ক আছে। সেখানে কোনও হিসেব চলে না। গীতাদি কখনও ফোন না করে আসে না। এদের কথা আমি বাদই দিয়েছি। কিন্তু যেখানে আমাদের যাতায়াত নেই — সম্পর্কটা ছিল শুধুই শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে, সেখানে আমি এই হঠাৎ খবর নিতে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান। আমি চাই না - যে অসুবিধাগুলি শ্রীপ্রীতিকুমারের স্ত্রী হিসেবে আমি ভোগ করেছি সেটি আমার পুত্রবধূ ভোগ করুক। আমিও তো আজকাল চিত্রা, কিশোর ও নীরেনদার বাড়ি ছাড়া সর্বত্র যাওয়া ত্যাগ করেছি প্রায়। শরীরে কুলোয় না, মানসিক ভাবেও বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

আজ এই পর্যন্ত থাক। তার আগে একটু প্রেসের কথা বলি। তাঁরা যা বানান কম্পোজ করছেন দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। তারা এখন “প্রয়াস” না করে “প্রয়াণ” করছেন। বাকীটা পরে বলছি..... ।

(** রচনাকাল - এপ্রিল, ১৯৯৪)



সাধারণ জীবন

শ্রীমা

মানুষের সাধারণ জীবন কতিপয় বাসনা কামনা এবং লোভের বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত মানুষ ঐ সবার মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে ততদিন কোন স্থায়ী উন্নতি হতে পারে না। ঐ চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লওয়া যাক সাধারণ জীবনের সব থেকে স্বাভাবিক মনোবৃত্তিটি — লোকে সব সময়েই

ভাবতে থাকে কী তারা খাবে, কখন খাবে, যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া হচ্ছে কিনা। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লোভ জয় করবার জন্য সত্তার মধ্যে এক সঙ্গতি স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে খাদ্য সম্বন্ধে লোকে একেবারে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে। খাদ্যদ্রব্য যখন তোমায় দেওয়া হবে তখন তুমি তা খাবে; যদি ইচ্ছামতন খাদ্য না পাও তাহলে তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠার উদয় হবে না; আর যাই হোক, তোমার মন সদাসর্বদা খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকবে না। সর্ব রকমের খাদ্য দ্রব্য ত্যাগ করবে এমন চিন্তাও যেন তোমার মনে স্থান না পায়। আহাৰ করা রূপ কর্ম বন্ধন থেকে কোন উপায়ে এবং কোন পদ্ধতিতে মুক্ত হওয়া যায় এইরূপ চিন্তা নিয়ে সন্ন্যাসীদের মতন ব্যস্ত থাকার অর্থ খাদ্য সমস্যার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকা, ঠিক যেমন সেইসব লোক থাকে যারা লোভের বশবর্তী হয়ে খাদ্যদ্রব্যের স্বপ্ন দেখতে থাকে। খাদ্য সম্বন্ধে নির্লিপ্ত মনোভাবই রক্ষা করা উচিত। নির্লিপ্ততাই আবশ্যিক। তোমার চেতনা থেকে খাদ্যের চিন্তা একেবারেই দূর করে দাও, বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দিওনা খাদ্য সমস্যাকে।

খাদ্যচিন্তা থেকে চেতনাকে মুক্ত করে নেওয়া খুবই সহজ হয়ে পড়ে যদি লোকে অন্তরের চৈতন্যময় সত্তার সংস্পর্শে আসে। অন্তরের গভীরতায় যে সত্য আত্মা রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক। অন্তরাত্মার সহিত মিলিত হলে লোক তৎক্ষণাৎ অনুভব করে কত তুচ্ছ এই সমস্ত বাহ্যিক জিনিষ। তখন লোকে উপলব্ধি করে যে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু যদি কিছু থাকে তাহলে তা ভগবান। **চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে বাস করলে লোকে সকল প্রলোভন এবং লালসার উর্ধ্বে উত্থিত হয়।** তখন থাকেনা কোন আকাঙ্ক্ষা কোন প্রবল বাসনা, কোন উৎকণ্ঠা। লোকে বোধ করে যে যা কিছু ঘটছে তা ভালর জন্যই ঘটছে। অবশ্য আমার বক্তব্যের ভুল অর্থ যেন করা না হয়। এমন কথা মেনে নেওয়া ঠিক নয় যে সব কিছুই সর্বোত্তম রূপে ঘটছে। লোকে সাধারণ চেতনায় যতদিন বাস করে ততদিন সবকিছুই সর্বোত্তম রূপে ঘটেনা। ব্যক্তিগত সাধারণ চেতনায় বাস করলে সম্পূর্ণরূপে ভ্রাম্যত্বক পথে মানুষ চালিত হতে পারে। কিন্তু যখন কেহ তার চৈতন্যময় সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত

থাকে এবং ভগবানকে যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তার জীবনে যা কিছু ঘটবে তা ভালর জন্যই ঘটবে। কারণ যেমন মুখোশ পরেই আসুক না কেন প্রত্যেকটি বস্তু নিশ্চিতরূপে হবে তার প্রতি ভগবানের প্রত্যুত্তর।

প্রকৃত পক্ষে, আন্তরিক আত্মসমর্পণ ক্রিয়াটিই তার নিজস্ব পুরস্কার নিজেই সত্ত্বর বহন করে আনে। আত্মসমর্পণের সাথে সাথে আসে এমন আনন্দ, এমন নির্ভরতা, এমন নিরাপত্তা যা আর কিছুতেই দিতে পারে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আত্মসমর্পণটি চৈতন্যময় সত্ত্বার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন বাধা বিপত্তি থাকবেই, আলোকময় মুহূর্ত গুলির ফাঁকে ফাঁকে পড়বে অন্ধকারের কালো ছায়া। একমাত্র চৈতন্যময় সত্ত্বাই অবিচ্ছিন্ন ধারায় উন্নতি করতে থাকে, তার গতি ক্রমাগতই উর্ধ্বমুখী। সত্ত্বার অন্যান্য অংশের গতিবিধি বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়—তাদের অগ্রগতির বিরাম বিরতি আছে। যতদিন পর্যন্ত কেহ তার চৈতন্যময় সত্ত্বাকে তার নিজস্ব প্রকৃত সত্ত্বারূপে বোধ করতে না পারছে ততদিন তার ব্যক্তিত্বই গঠিত হতে পারে না। কারণ ঐ চৈতন্যময় সত্ত্বাই মানুষের প্রকৃত সত্ত্বা। প্রকৃত সত্ত্বাকে না জানা পর্যন্ত লোকে হয়ে থাকে একটি সরকারী উদ্যানের মতন, প্রকৃত ব্যক্তি নয়। বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধী শক্তি মানুষের মধ্যে কাজ করে। সুতরাং উন্নতি করবার জন্য প্রকৃত সত্ত্বাকে জানতে হবে। ঐ সত্ত্বা সর্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত থাকে। প্রকৃত সত্ত্বার সংস্পর্শে আসার পরই রূপান্তরের কাজ আরম্ভ হতে পারে। সত্ত্বার অন্যান্য অংশগুলি অজ্ঞান। প্রত্যেকটি চাকচিক্যময় ধারণাকেই মন আলোময় সত্যের প্রকাশ রূপে গ্রহণ করে। মানুষের মন ঠিক সমান জোরের সঙ্গেই ভগবানের সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিদান করতে পারে। সত্য স্বয়ং নিভুল অনুভূতি মানুষের মনের নাই। আর মানুষের প্রাণ সত্ত্বা সাধারণতঃ শক্তির খেলা দেখলেই আকৃষ্ট হয়। তাই ভগবৎ প্রতিম লোকের মধ্যে সে শক্তির খেলা দেখতে চায়। কেবলমাত্র অন্তরের চৈতন্যময় সত্ত্বাই ঠিক ভাবে বিচার করতে পারে। চৈতন্যময় সত্ত্বা প্রত্যক্ষরূপে পরমতম দিব্য উপস্থিতি স্বয়ং সচেতন। অব্যর্থভাবে সে দিব্য এবং অদিব্যের মধ্যে প্রভেদ করে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি কেউ তার অন্তরের চৈতন্যময় সত্ত্বার সংস্পর্শে আসে

তাহলে ভগবানের উপস্থিতি সম্বন্ধে এমন এক নিশ্চয়তা এসে যায় যা কোন কিছুতেই বিচলিত হবে না।

অন্তরের চৈতন্যময় সত্তাকে কোন্ উপায়ে জানা যায় সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাকে জানতে চাইতে হবে, জানবার জন্য আত্মপূহা করতে হবে, এমন ভাবে চাইতে হবে যেমন ভাবে লোকে আর কোন কিছুকেই চায় নাই। এই আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই চৈতন্যময় সত্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু চৈতন্যময় সত্তার প্রভাবই যথেষ্ট নয়। তার সহিত একত্ব বোধ থাকা প্রয়োজন। পরিপূর্ণতা লাভের জন্য সকল প্রেরণা চৈতন্যময় সত্তা থেকে আসে। লোকে কিন্তু সে সম্বন্ধে সচেতন নয়; লোকে সজ্ঞানে চৈতন্যময় সত্তার সহিত সহযোগিতা করে না; তার আলোর সহিত সংযুক্ত থাকে না। চৈতন্যময় সত্তা বলতে লোকের ভাবময় সত্তাকে বুঝলে চলবে না। ভাবপ্রবণতা উচ্চতর প্রাণসত্তার খেলা মাত্র। তা চৈতন্যসত্তা থেকে আসে না। চৈতন্যময় সত্তা আমাদের অন্তরের সেই নিষ্কম্প অগ্নিশিখা যা ঊর্ধ্বমুখে ভগবানের দিকে উত্থিত হয়। চৈতন্যসত্তার মধ্যে রয়েছে এক শক্তির অনুভূতি যা সব বাধা বিঘ্ন ভেঙ্গে নিঃশেষ করে দেয়। কেহ যখন তার চৈতন্যময় সত্তার সহিত একত্ব উপলব্ধি করে তখন দিব্য সত্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয়—আর তার বোধ হয় যেন সমস্ত জগৎ অজ্ঞান ভাবে মাথার উপর হেঁটে চলেছে আকাশ পানে পা তুলে।

লোকের সাধারণ ব্যক্তিত্বকে অন্তরের চৈতন্যময় সত্তার সহিত এক করে দিতে হবে। সাধারণ ব্যক্তিত্ব একটি মিশ্রিত বস্তু; উহা একটি সমষ্টি যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং যা একই সত্তার ক্রমানুগত ধারা কোনক্রমে রক্ষা করে চলেছে একটা একত্ব বোধ থেকে। পরিবর্তনের স্রোতে একটি ব্যক্তিগত কম্পন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সাধারণ ব্যক্তিত্ব যেন একটি নদী যা কখনই এক নয়, অথচ যার এক ধরণের নির্দিষ্ট রূপ আছে এবং নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। মানুষের সাধারণ ব্যক্তিত্ব তার প্রকৃত সত্তার ছায়া মাত্র। প্রকৃত সত্তা তখনই অনুভূত হয় যখন এই সাধারণ সত্তা অন্তরের চৈতন্যময় সত্তার সংস্পর্শে আসে এবং তাকেই প্রকৃত সত্তারূপে অনুভব করে। সাধারণ ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কখনও বা মনের,

কখনও বা প্রাণের আবার কখনও বা দৈহিক প্রকৃতির রূপ ধারণ করে। চৈতন্যময় সত্তার সহিত একত্ব বোধ হলে লোকে একটি অক্ষুণ্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করে, যাকে কোন কিছুতেই বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। লোকে তখন দৃঢ় ভাবে স্থায়ী উন্নতি করতে সক্ষম হয়, এবং খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে লালসা বা উৎকর্ষার মতন তুচ্ছ প্রবৃত্তির বহু উর্ধ্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে।



রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের তাৎপর্য

শ্রীমতী যুক্তা চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের বলাকা গতিরোগের কাব্য, গতিরাগ কথাটির অর্থ প্রাণের প্রচণ্ড বেগে অনন্তের উদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়া। শুধুমাত্র ‘একটা জীবন’ নয় আরও জীবনের পথযাত্রী আমরা। শুধুমাত্র একটা প্রেম নয় বিচিত্র প্রেমের অভিজ্ঞতার দিব্যরাগে আমরা রঞ্জিত হব। যা পেয়েছি যতটুকু করেছি তার চেয়ে ঢের বড় আমাদের জীবন। যে প্রেম আমরা এ জীবনে আশ্বাদ করেছি তার চেয়ে গভীরতর মহত্তর প্রেম অপেক্ষা করছে আমাদের অনাগত জীবনে। এই বৃহত্তর প্রেম, এই বৃহত্তর জীবন, এই বৃহত্তর আনন্দকে লাভ করার জন্য বিশ্বচরাচর মানুষ থেকে অণুপরমাণু পর্যন্ত প্রত্যেকটি জীব ধাবমান হয়ে চলেছে। বলাকা কাব্য এই এগিয়ে চলার ব্যঞ্জনা।

জীবনের প্রতিস্তুরেই আছে একটা পরিবর্তন। আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতে আমরা শৈশব ছেড়ে এগিয়ে যাই কৈশোরের দিকে, কৈশোরের বেশ পরিত্যাগ করে পরিচয় হয় যৌবনের সাথে, যৌবনের আনন্দকে ত্যাগ করে বরণ করতে হয় বার্ধক্যের জরাজীর্ণতাকে, আবার বার্ধক্য থেকে এগিয়ে গিয়ে জরাজীর্ণতাকে ত্যাগ করে মৃত্যুর গভীরে স্নান সারতে হয়—এগিয়ে যেতে হয় নবজীবনের আনন্দের পথে।

যে দেহতে আমরা জন্ম নিয়েছি তাকে ছেড়ে যেতেই হবে যতই তার প্রতি মায়ায় আমরা বদ্ধ হই না কেন। সুতরাং কোনও অবস্থাতেই যেন ‘জীবন’ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও মোহ না থাকে। অন্তরের মধ্যে সদাই যেন থাকে একটা ‘পথিকবোধ’। সংসারে যা কিছু করি, যা কিছু পাই যা কিছু হই — সর্বদাই অন্তরের মধ্যে সেই পথিকবোধ যেন জাগ্রত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তখন আর কিছুতেই তুষ্ট থাকিনে, তখন ভূমৈব সুখম নাশ্লে সুখমস্তি, যা পেলে পূর্ণ হব সেই ভূমা, সেই প্রভূতের অভিসারে সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলি।

ঋগ্বেদে এই গতিবাদের সমর্থন রয়েছে -

কবিগুরুর এই গতিবাদের চেতনার সঙ্গে কোনও কোনও সমালোচক প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দর্শনের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতীয় চেতনার মধ্যে গতির অতি পুরাতন তাগিদ রয়েছে। প্রাচীন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে আত্মা ক্রমাগতই চলে। ঋগ্বেদের মন্ত্র হল ‘চরৈবেতি’ অর্থাৎ এগিয়ে চল। বিশ্ব জগতে সবকিছুই ক্রমাগত ঘুরছে, এগিয়ে চলছে। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—অনেজদেকং মনসো জবীয়ো – তিনি সর্বব্যাপী, এক এবং চিরস্থির হয়েও মনের চেয়েও দ্রুতগামী বা বেগবান। ভারতবর্ষের যা জীবনতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যে রয়েছে তার সেই ব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের গতিবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। হেগেলের মতে অপূর্ণ জীব তার সমগ্র জীবন নিয়ে পূর্ণের দিকে এগিয়ে চলেছে। হেরাক্লিটাস বলেছেন গতিই সত্য এবং চিরন্তন। গতির ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে। “Universal life is an endless alteration of creation and destruction—it is not possible to descend twice in the same

Stream”—তিনি বলেন জীবন প্রতিনিহুর্তে সৃষ্টি এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যে নদীতে আমরা ডুব দিই পর মুহূর্তে ডুব দেবার সময় সেই স্রোতে ডুব দিতে পারি না। কেননা ইতিমধ্যেই স্রোতের পরিবর্তন হয়েছে। জীবনটাও তেমনি প্রতিনিহুর্তের পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে।

গতিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা অপরাপর কাব্যে -

বিশ্বগতি সম্বন্ধে বলাকা কাব্যে সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে—এই গতিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বলাকা কাব্যের যুগেই জানতে পেরেছিলেন এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রথম সময় থেকে এই গতিচেতনা স্থান পেয়েছে। পৃথিবীর প্রতি যত মোহ যত প্রেমই থাকনা কেন সব ত্যাগ করে বিশ্বগতির দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই কবি একদা বলেছিলেন “আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী”। সাহিত্য জীবনের প্রথম লগ্নে কবিকাহিনী লিখতে গিয়ে কবি বলছেন - নায়ক নারীর সান্নিধ্যে প্রণয় পেয়েও গৃহবন্দী হতে পারল না, বলল সংসার জীবনে যা কাম্য যা প্রার্থনীয় সবই তো পেলাম, তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটল না মোর। তবু কেন ঘুচিলনা প্রাণের শূন্যতা।”

প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরনের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি গতি ব্যাকুলতার একটি বিখ্যাত কবিতা

- “কি জানি কি হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ...”

মানসী কাব্যে কবির বেদনা - “ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন,” অথবা উৎসর্গ কাব্যে কবির বলা—

“সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া।”

বলাকা কাব্যে যে সত্য তার পূর্ববর্তী কাব্যেও সেই একই সত্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে। সীমাবদ্ধ জগৎ থেকে অসীমের দিকে তার অভিসার করার কথা কবি বার বারই বলেছেন, পার্থক্য এই যে, বলাকায় এই সত্য আরও স্পষ্টভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বলাকা কাব্যের বলাকা কবিতা এই গতিতত্ত্বেরই রসরূপ। এই কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন - অপ্রাপনীর অশেষে ব্যাকুলতা অধরার সন্ধানে যাত্রা এটি পৃথিবীর সমস্ত মানব সম্বন্ধে সত্য এমন কি সমগ্র বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে সত্য। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিলম নদীর নিঃসঙ্গ নির্জনতার অবকাশে উড়ে গেল সহসা একঝাঁক হংসবলাকা। তাদের পাখার ঝাপটে ভাবময় সেই অভিনব অন্ধকারে শব্দের বিদ্যুৎছটা হল প্রভাসিত। ঐ রহস্যময়ী জ্যোতির্ময়ীর চকিত রূপে—

“উঠিল শিহরি, গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার বন।”

বলাকা তার পাখার ঝাপটানি দিতে দিতে চলেছে অশ্রান্তভাবে। তার পাখাকে সে থামিয়ে দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অমৃত সাগরে মানস সরোবরে গিয়ে পড়তে পারে। তার এই অক্লান্ত পক্ষধ্বনি প্রকৃতির সর্বত্র—নদী, গিরি, বন সর্বত্র নব ভাবের চঞ্চলতা এনে দিল, তখন ‘নিশ্চল’ অন্তরে অনুভব করতে লাগল ‘বেগের আবেগ’। তখন—

“পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি—মাটির বন্ধন ফেলি ওই শব্দ রেখা ধরে
চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা

‘আকাশের কিনারা’ খুঁজতে অর্থাৎ গতির শেষ কোথায় তা বুঝতেই আমাদের নিত্যগতি। বিশ্বচরাচরের মধ্যে এই গতিটুকু সর্বদাই রয়েছে। যা পেয়েছি, যা হয়েছে

তাতে তো শান্তি নেই, আরও কিছু আরো বৃহত্তর সন্ধানে আমরা ‘অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে’ যাবার বেদনা অনুভব করি। কিন্তু গন্তব্য স্থান যে কোথায় তার ঠিকানা নেই।

বহির্জগতে কবি উপলব্ধি করলেন ‘গিরিশ্রেণী’ ‘বনরাজি’ ‘দ্বীপ’ ‘দ্বীপান্তরের’ মধ্যে গতিব্যাকুলতা আর অন্তরে কবি উপলব্ধি করলেন যুগ যুগান্তরে মানুষের মনও এগিয়ে চলেছে — ‘অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে’, ধাবমান হচ্ছে মানুষ যা অনায়ত্ত তাকে আয়ত্ত করার জন্য, যা পায়নি তাকে পাবার জন্য।

দুঃখ মৃত্যু এবং পাপে পূর্ণ এই পৃথিবীই আমার জীবনের পরম কথা নয়, আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, প্রাত্যহিকতার গ্লানিকে এড়িয়ে আনতে হবে অমৃতের সন্ধান।

“এসেছে আদেশ

বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মতো হল শেষ।”

এ বন্দর হলো পুরোনো জীবনে আটকে থাকবার বন্দর; ‘বন্ধনকাল শেষ’ হবার অর্থ আনন্দের দিকে অমৃত সাগরের দিকে এগিয়ে যাবার ব্যঞ্জনা।

নবজীবনের ডাক যখন শুনেছি আর থেমে থাকলে চলবে না। একদিন এ পৃথিবীতে ‘নূতন উষার স্বর্ণদ্বার’ খুলব - এ বিশ্বাসে এগিয়ে চলব। সারারাত্র অতন্দ্র সাধনা করে নক্ষত্রদল প্রভাত আনে, প্রভাত এলে তারা হারিয়ে যায়, তবু সেইখানেই তাদের আনন্দ। তেমনি মানুষও এগিয়ে চলবে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করার জন্য, হয়তো তাদের কষ্ট হবে তবুও এই এগিয়ে চলাতেই আনন্দ, কেননা তাদের তপস্যার ফলেই একদিন না একদিন অমৃতের আবির্ভাব হবে।



“চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥”

[চৈতন্য চরিতামৃত]

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মোটামুটিভাবে ছয় বছর ভারততীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই সঙ্গে তিনি প্রচার লীলাও করে গেছেন। তিনি যে যে দেবস্থান, দেবভূমি, পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - কূর্মস্থান, জিয়ড় নৃসিংহের মন্দির, কোটিলিপেশ্বরের মন্দির, মল্লিকার্জুন স্বামীর মন্দির, অহোবলম নৃসিংহ মন্দির, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, তিরুপতি, পান নৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, বেদগিরিশের মন্দির, পক্ষীতীর্থ, বৃদ্ধকোল তীর্থ, মহাবলীপুরম, শৈবতীর্থ বেদাবন, কুম্ভকোণমে সারঙ্গপাণির বিষ্ণুমন্দির, পাপলম গ্রামের বিষ্ণুমন্দির, ঋষভ পর্বত বা পালানী হিলস, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান ও নয়টি বিষ্ণুমূর্তি দর্শন, গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থ, বৈকুণ্ঠ নাথের মন্দির, শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি কালাডি, কোলাপুরে মহালক্ষ্মী মন্দির, ধনুস্তীর্থ।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তীর্থলীলা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি শুধু বহু তীর্থস্থান দর্শন করেন নি, তিনি অসংখ্য মানুষের কাছে গেছেন, আবেদন করেছেন, একবার হরি বল ভাই। বহু মানুষ হয়েছেন পরম বৈষ্ণব। এভাবে তিনি নামের মহিমা প্রচার করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে বিদায় নিয়ে বর্ধমানের কাঞ্চননগরে পৌঁছিলেন। তিনি দামোদর পেরিয়ে কাশী মিশ্রের বাড়ী উঠলেন। কাশী মিশ্র বিশিষ্ট ধনী। তিনি মহাপ্রভুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে খেতে দেওয়া হল উত্তম চালের ভাত। চৈতন্যদেব প্রশ্ন করলেন,

এই চালকে কি বলা হয়? তাঁকে জানান হল, এই চালের নাম গোপালভোগ। গোপাল নাম শুনে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হল। দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মহাপ্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে কাটোয়া থেকে তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণ করলেন। এরপর তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ীতে আসেন। এখান থেকে তিনি নীলাচল যাত্রা করেন। তখন হাঁটাপথে পুরী যেতে হত। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে হাজির হওয়ার আগে যে সব অঞ্চল পেরিয়ে আসেন : আটিসারা, ছত্রভোগ, প্রয়াগঘাট, গঙ্গাঘাট, শ্রীগ্রাম, দানিঘাটি, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমুনা, যাজপুর, ভুবনেশ্বর, ভার্গবীতীর, কপোতেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন সফল প্রচারক। এর আগে এত সফলভাবে কেউ নামগান প্রচার করতে পারেন নি।

রেমুনা বালেশ্বরের পশ্চিমে। এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ বিদ্যমান। আঠারনালা হল শ্রীক্ষেত্রের এক ছোট নদী। নদীর ওপারে এক সেতু আছে। সেতুতে আঠারটি নালা আছে, তাই তার নাম আঠারনালা। এই সেতু পার হয়ে পুরীতে প্রবেশ করতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাজিপুরে এলেন। তিনি হাজিপুরে পৌঁছতেই এক যুবক তাঁর সামনে এলেন। যুবকের নাম কেশব সামন্ত। কেশব ধনী। কেশব চৈতন্যদেবকে বললেন, আপনাকে কিছু টাকা দিতে চাই। সেই টাকা দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে নেবেন। আপনি এ পথ ছেড়ে দিন। একজন যুবক কখনও সন্ন্যাসী হতে পারে না। আপনি মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে নানাভাবে বোঝালেন। তিনি বললেন, একজন মানুষ যখন ডুবে যায়, সে তখন দেখতে পায় না তীরে কি হচ্ছে। কিন্তু কেশব সামন্তকে বোঝানো গেল না। চৈতন্যদেব গোবিন্দকে বললেন, চল নারায়ণপুরে। হাজিপুরে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীচৈতন্যদেব নারায়ণপুরে এলেন। দুজন অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশিষ্ট ধনী ভদ্রলোক সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখতে এলেন। তাঁরা চৈতন্যদেবের ভক্তিভাব দেখে মুগ্ধ হলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব জলেশ্বরে এলেন। তিনি এখান থেকে সুবর্ণরেখা পার হলেন। তিনি বালেশ্বরে পৌঁছলেন। তিনি বালেশ্বরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বৈতরণী মহানদী পার হলেন। তিনি আমারদা' আর রামচন্দ্রপুর পরিদর্শন করলেন। রামচন্দ্রপুরে এক পদস্থ কর্মচারী রামচন্দ্র খান নদী পেরোতে সাহায্য করেন। এক রাজ্যের সীমানা থেকে আর এক রাজ্যের সীমানায় যেতে গেলে কর্মচারীরা নানা ঝামেলা করেন। রামচন্দ্র খানের হস্তক্ষেপে চৈতন্যদেবের কোন অসুবিধা হল না।

রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবের জন্যে নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন। রামচন্দ্র খান মাঝিদের সতর্ক করে বলেছিলেন, নৌকায় যেন চোঁচামেচি, গোলমাল না হয়। চারধারে গুপ্তচর ঘুরছে। তখন গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের বিরোধ চলছিল।

তীর্থপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেব বহু তীর্থ দর্শন করেছেন আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করেছেন। তিনি প্রতিটি মানুষের ঘরে গেছেন, যাকে সামনে পেয়েছেন, তার হাত ধরে বলেছেন, 'কৃষ্ণ বল ভাই। কৃষ্ণের নাম গাও ভাই'। তিনি রেমনাতে গোপীনাথ দর্শন করেন। কবির ভাষায় - রেমনাতে গোপীনাথ পরম মোহন। ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন। গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা। তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন : ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম। ভক্তগণ কহে প্রভু সেই ত আখ্যান। রেমনাতে গোপীনাথের পরম মোহন মূর্তি দেখে চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশ হল : রেমনাতে কৈল গোপীনাথ দরশন। তার রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥

চৈতন্যদেব যাজপুরে এলেন। তিনি বরাহঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তিনি কটকে সাক্ষীগোপাল দেখতে গেলেন। সাক্ষীগোপালের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি

ভুবনেশ্বর হয়ে কমলপুরে আসেন, ভার্গী নদীতে স্নান করে কপোতেশ্বর দেখতে গেলেন।

চৈতন্যদেব আলালনাথ হয়ে পুরীতে ফিরলেন। বহু মানুষ চৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা জানালেন। গোবিন্দ দাস লিখেছেন-

খঞ্জন আচার্য আসে গাঢ় অনুরাগে।

খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে।

গোবিন্দ দাস আরও লিখেছেন:

রামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।

বলরাম দাস আইসে হয়ে হরষিত॥

নর হরি দেখা দেয় নিশান লইয়া।



ঝটিকা সফর তিন শহর

শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য

Zurich-এর হোটেল 'MERCURE' থেকে রওনা হয়েছিলেন সকাল পৌনে ন'টায়, আর দিনের শেষে Innsbruck-এর 'ALPENCONING TIROL'-এ চেক-ইন করার আগে ডিনার খেয়েছি মোটামুটি ওই রাত পৌনে ন'টাতাই। মাত্র বারো ঘন্টা! এর মধ্যে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ার মত দুই দেশের তিন শহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখা মানে তো পক্ষীরাজকেও হার মানানো— তা অস্ট্রিয়া যতই জার্মানির লেজে লেপ্টে থাকুক না কেন। জার্মানিতে আমাদের দেখার ছিল শুধুই মিউনিখের BMW মিউজিয়াম, যদিও চলতি পথে বাইরে থেকে হলেও 'ALLIANZ ARENA'-র মত বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল স্টেডিয়াম আমাদের চোখে পড়েছে। তাছাড়া চলতে চলতে আল্পস পর্বতমালার উত্তরের এই শহরে 'ISAR' নদীর সাথে আপনার মোলাকাত হবে না, সেটা তো হতে পারে না। ১২ ঘন্টার ভ্রমণ সূচীতে মিউনিখের পরেই

আমাদের ছুটতে হয়েছিল ১৪৮ কিলোমিটার দূরে আল্পাইন নেচার-এর মধ্যে সুন্দর 'ওয়াটেন্স' (WATTENS) শহরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বাইরেও যে কারণে ওয়াটেন্স-এর বিশ্বখ্যাতি তা 'SWAROVSKI CRYSTAL' কোম্পানির জন্মস্থান হিসেবে। ওয়াটেন্স থেকে ২১ কিলোমিটার দূরের ইন্সব্রুকে রাত কাটাবার আগে সেখানকার 'সোনালী ছাদের' (GOLDEN ROOF) রহস্যভেদ ছাড়া অন্য কিছু করার সময় আমাদের ছিলনা, তবু ৩০শে মে'র আধখানা দিন আমাদের যেমন ছুটিয়েছে তেমনি দেখিয়েছেও প্রাণ ভরে। গল্পের শুরুটা হয়েছিল ২২শে এপ্রিল। মোটামুটি নামকরা এক টুর কোম্পানির সাথে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে স্টার্টার বলতে পেয়েছি শুধুই কাতারের রাজধানী দোহা-র এয়ারপোর্ট। তারপর সওয়া সাত ঘন্টার উড়ানে কাতার এয়ারওয়েজ আমাদের বসিয়ে দিল মেক্কোসের টেবিল লগুনে। তারপর একের পর এক উপাদেয় মেনুর মতো প্যারিস আর সুইজারল্যান্ডের দ্রষ্টব্যরা দেখা দেওয়ার পর সে দেশে শেষ রাতটা এসেছিল 'জুরিখ সিটি'-র 'মেরকিউরে হোটেল' হিসেবে। পরদিন মিউনিখের পথে বেড়াবার আগে হোটেল লাগোয়া 'COOP'-এর দোকান থেকে এতটাই চকোলেট কিনেছিলাম যাতে দুই বুড়ো-বুড়ির রসনাকে তৃপ্তি করে কিছু অন্তত দেশে নিয়ে ফিরতে পারি— পাড়ায় প্রফেসার দাদুর নাতি-নাতনিদের সংখ্যা তো কিছু কম নয়।

Zurich থেকে Munich-এর দূরত্ব বড় কম নয়, প্রায় ৩১১ কিলোমিটার। তবু মাখনের মত চলার পথের পাশে সবুজ তৃণভূমিকে থামিয়ে দেওয়া বরফের পাহাড়গুলো শরীর মনকে ক্লান্ত হতে দেয় না। ১০০ কিলোমিটার বেগে গড়গড়িয়ে চলা লাক্সারি বাস যেখানে পথের কমা, সেমিকোলন পেরিয়ে মিউনিখের 'AM OLIMPIAPARK'-এ একেবারে ফুলস্টপ হয়ে গেল, সেখান থেকেই চোখ গোলগোল হয়ে যায় ফোর সিলিন্ডার ইঞ্জিনের আদলে চার টাওয়ারের BMW সদর দপ্তর দেখে। লাগোয়া 'BOWL SHAPED' বাড়িতেই যে ৫০০০ বর্গমিটারের মিউজিয়াম লুকিয়ে আছে, তা বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখার আগে মাথায় ঢোকেনি। বুড়ো মাথার আর দোষ কি— যা চরকি বাজি চলছে। মিউজিয়ামে ঢুকে ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো

গাড়ির ইতিহাস যেমন দেখেছি, তেমনই জেনেছি বর্তমান যাদুঘরের জন্মদিনের কথা। ১৯৭২ সালের মিউনিখের সামার অলিম্পিকের কথা মনে আছে? এই মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে ঠিক তারপরেই – ১৯৭৩ সালের ১৮ই মে। কি নেই BMW-র এই আজবশালায়! প্রায় ১২৫টি ঐতিহাসিক ও দুর্মূল্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে যেমন ক্লাসিক গাড়ি, মোটর সাইকেল আর বিমান ইঞ্জিন রয়েছে, তেমনই রয়েছে এ্যান্ডি ওয়ারহোল অথবা জেফ কুনসের মত বিখ্যাত শিল্পীদের হাতে আঁকা ও ডিজাইন করা স্পেশাল আর্ট কার। সাধারণ পর্যটকেরা অবশ্য মজে যায় বকবকে আকাশছোঁয়া দামের মোটর সাইকেল আর গাড়ির শো-রুমে। দোষই বা কোথায়? ৩৮ লাখি মোটর সাইকেল চেপে যদি ফটো তোলার সুযোগ থাকে তবে তো সেখানে লাইন লাগবেই। আর গাড়ি? ৪৫.৮ লাখ থেকে শুরু করে আড়াই কোটিরও বেশি দামের গাড়ির স্পর্শ যদি একটা ছবি হয়ে বসার ঘরের দেওয়ালে শোভা পায়, সে সুযোগ আর ছাড়ে কে? ভাববেন না এই আদেখলাপনা শুধু বাঙালিরই একচেটিয়া, গাড়ি-বাইকের সামনে পোজ নিয়ে ফটো তোলার হিড়িক কিন্তু দেশি বিদেশি সব নাগরিকেরই।

মিউনিখের পর আমাদের গন্তব্য যে অস্ট্রিয়ার ওয়াটেন্স, সে কথা তো আগেই বলেছি, যেটা বলা হয়নি তা হলো Innsbruck থেকে ১৫ কিলোমিটার পূর্বের এই শহরের ‘SWAROVSKI MUSEUM’-এর কথা। সোয়ারোভস্কির জুয়েলারি স্টোর আমাদের কলকাতাতেও আছে, তবে সেখানে উঁকি দেওয়াই সার – কিছু কেনা হয়নি হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু এই কোম্পানির যে বিশ্বের অন্ততঃ ১৬০ দেশে ২৪০০-র বেশি শো-রুম আছে, তা আগে কে আর জানতো! শুরুটা অবশ্যই ১৮৯৫-তে ওয়াটেন্সে ক্রিস্টাল কোম্পানি স্থাপিত হওয়ার পর, আর মিউজিয়াম? ঠিক তার শতবার্ষিকী পূর্ণ হলে অর্থাৎ ১৯৯৫তে। সঠিক দিনটা যে পাঠকদের জানাতে পারলাম না সে দোষ আমার নয় – স্বয়ং গুগল বাবাজীর। সবজান্তা যদি এ ব্যাপারে নীরব থাকে অধম এই লেখক আর কি করতে পারে? শুরুর পরে আকারে প্রকারে মিউজিয়াম ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয়ে এখন এমনই রূপ

নিয়েছে যে আজ সে অস্ট্রিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন ক্ষেত্র। না হলে প্রায় ৮৪,০০০ বর্গ কিলোমিটারের দেশে খুঁজে খুঁজে ভ্রমণ সংস্থা আমাদের এখানে নিয়ে আসে? আগুর গ্রাউণ্ড আর্ট মিউজিয়ামের কথা আগেই জানতাম কিন্তু ‘চেস্কার অফ ওয়াভার’ অথবা ‘ক্রিস্টাল ক্লাউড’ যে এত আকর্ষণীয় হতে পারে তা না দেখলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না। শুধু কি তাই? বিস্তীর্ণ সবুজ বাগানে ততোধিক সবুজ ‘ক্রিস্টাল জায়ান্ট’-এর মুখ নিঃসৃত জলের ফোয়ারা যে জলাশয় তৈরি করে ফেলেছে, তা কিন্তু শুধুই শিশুদের নয়, আমাদের মত সিনিয়র সিটিজেনদেরও কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে দেয়। তবে এমন আনন্দ-নিকেতনে কিন্তু নিরানন্দের ছোঁয়াও আছে। একবার ক্রিয়েটেড ডায়মন্ড শো-রুমে আসুন, বুঝবেন সুখ-দুঃখের পাশাপাশি অবস্থান কাকে বলে। হীরের চমক নিয়ে ক্রিস্টালের হাজার কিসিমের পশরা বলে ‘আমাকে নাও’, অথচ কিনতে গেলে মানিব্যাগটা ব্যথায় চোঁচিয়ে ওঠে! তাই গিল্লির কিনি কিনি মনোভাবটাকে সপাটে কলকাতার সাউথ সিটি মলে পাঠিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ দামী হওয়া ইউরোপুলোকে বাঁচিয়ে রাখি! দিল্লী যে এখনও বহু দূর!

সোয়ারোভস্কি ক্রিস্টাল ওয়ার্ল্ড-এর ওয়াভার শেষ হলে ভ্রমণসূচী আমাদের নিয়ে এল পশ্চিম অস্ট্রিয়ার টাইরোল প্রদেশের রাজধানী ইন্সব্রুকে। সেই ইন্সব্রুক— ১৯৬৪ আর ১৯৭৬-এর শীতকালীন অলিম্পিকের আয়োজক হিসেবে যার খ্যাতি। এছাড়াও সারা বিশ্বে আল্পাইন পর্যটনের জন্য তার যে এত নাম একথাও আমাদের অজানা ছিলনা। যেটা জানতাম না তা হলো Inn (ইন) নদীর তীরে বিশাল পাহাড়ঘেরা আল্পাইন অবস্থানের কারণে Innsbruck এত মোহময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা যদি বাদও দিই, শহরের বুলেভার্ড (BOULEVARD), মধ্যযুগীয় স্থাপত্য আর রাজপ্রাসাদ দেখতেই দিন কেটে যায়। দুঃখের বিষয় ভালো করে দেখতে যে সময় লাগে, তার সিকি ভাগও আমাদের জোটেনি। তাঁর মধ্যেও ‘হফবুর্গ’ প্রাসাদের কাছে ‘লিওপোল্ড ফাউন্টেন’ বা ‘লেওপোল্ডস’ ব্রনেন’ দেখতে আমাদের ভুল হয় নি। ফোয়ারার ওপরে ব্রোঞ্জের অশ্বারোহী মূর্তিটি যে টাইরোলের আর্চ ডিউক পঞ্চম লিওপোল্ডের, সেটা মূর্তির বেদিতেই লেখা আছে। তবে এই ঐতিহাসিক

স্মারকটি যে ১৬২২ থেকে ১৬৩০ সালের মধ্যে তৈরি, সে খবর গুগল বাবাজী না জানালে জানতে পারতাম না। ইতিহাসে উৎসাহী হলেও ইতিহাসের ছাত্র নই, তাছাড়া লিওপোল্ডের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও খুব একটা ছিলনা, তাই শহরের বিখ্যাত রাজপথ 'মারিয়া থেরেসা' যখন আমাদের নিয়ে চলছিল ওল্ড টাউনের প্রধান আকর্ষণ 'গোল্ডেন রুফ'-এর দিকে তখন সোনালী ছাদের মায়ায় মজতে আমরা যথেষ্টই ব্যগ্র ছিলাম। কিন্তু সে পথেও যে 'একটু দাঁড়াও' বলে ইয়েসুইটেন কির্চে বা 'জেসুইট চার্চ' (JESUIT CHURCH) হাজির হয়ে যাবে তা কে জানতো? না দাঁড়িয়ে উপায় কি? ১৬২৭ থেকে ১৬৪৬ সালে তৈরী এ চার্চ যে 'বারোক' স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে অবস্থিত এই অফিসিয়াল চার্চ অফ ইঙ্গরুক ইউনিভার্সিটির জমকালো দুই টাওয়ারের সামনেটা যখন তন্নয় হয়ে দেখছি তখন কে যেন জানিয়ে দিল এই স্থাপত্য নাকি রোমের 'ইল গেসু চার্চ' দ্বারা অনুপ্রাণিত। অবাক হয়েছিলাম, এই ভেবে যে অনুপ্রেরণার অফুরন্ত যোগান শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই একচেটিয়া নয়, মধ্যযুগের ইউরোপেও তা যথেষ্টই ছিল।

দিন ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসে। সেদিনের রাতের আশ্রয় থেকে ডিনারের ডাক যেন শ্যামের বাঁশি হয়ে জঠরজ্বালাকে উন্মত্ত করে তুলছিল। পেটে ছুঁচোর ডন মারার আর দোষ কি? সাত সকালের কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট যতই হেভি হোক না কেন পায়ে পায়ে শহর দেখার পর শেষ দুপুরে তা হজম হতে বাধ্য। আর চলার পথে লাঞ্চার নামে বাস ম্যাকডোনাল্ড জাতীয় যে সব দোকানের স্ট্যান্ডে দাঁড়ায়, তাতে দুপুরের বরাদ্দ আট ইউরোতে ক্যাফের কফি-ই জোটে, তাঁর বেশি কিছু নয়। তাই ভ্রমণ সংস্থার আনুকূল্যে মন-প্রাণ ভরানো ডিনারের গং যদি বাজে, আমরা তো ছুটবোই। তবে আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে 'সোনালী ছাদের' স্কোয়ারে পা রাখার পর দেখি সকলেই ক্ষিদে ভুলে ফটো তোলায় ব্যস্ত। হতেই পারে, সামনেই যে টাইরোল রাজাদের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ১৪২০ সালে এখানকার সার্বভৌম শাসকদের আবাসস্থল হিসেবে, পরে ১৪৯৩ সালে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের

(MAXIMILIAN) নির্দেশে সংযোজিত হয় সোনালী ছাদের ব্যালকনি। ‘গোল্ডেন রুফ’ প্রধান আকর্ষণ হলেও পুরো অঞ্চল জুড়েই রয়েছে যেন রাজকীয় সৌরভ। প্রাসাদের মিউজিয়ামে রয়েছে ম্যাক্সিমিলিয়ানের জীবন এবং সমসাময়িক কাল। তবে সত্যি বলতে কি এমন প্রাসাদ আমরা ভ্রমণ কালে অনেক দেখেছি, শুধুই ২৬৫৭ টি সোনার আস্তরণে বাঁধানো আমার টাইলসের কল্যাণে এটি এখন Innsbruck-এর প্রধান প্রতীক ও পর্যটন কেন্দ্র। যে ‘গোল্ডেন রুফ’-এর অলিন্দ থেকে একদিন রাজপরিবারের সদস্যরা নীচের চত্বরে অনুষ্ঠান ও উৎসব দেখতেন, কালের প্রবাহে তা বদলে গেছে। দিনের শেষ সূর্যের আলোয় আমরা ‘সোনালী ছাদের’ চকচকানি দেখছি, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের দেখার জন্য আজ আর কেউ নেই!



বাইক আরোহী লেখক



বিএমডব্লু মিউজিয়াম



এক নজরে বিএমডব্লু জগৎ



আলপাইন প্রকৃতি



চেম্বার অফ ওয়াশার



গোল্ডেন রুফ, ইন্সব্রুক



ইন্সব্রুকের পথে

যোগাসনে দেবী মৃন্ময়ী,
দূরে কাছে শবের সমারোহ।
হয়তো জিহাদি ফাঁদ,
হয়তো নিছকই ভুল ... নির্মম ভুল ...
দর্শনার্থী হয়ে গেলেন দ্রষ্টব্য।

এভাবেই হারিয়ে যায় দিকশূন্য মানুষ।
কখনো ভোটকোশির হড়পা বান,
কখনও ধাপার আগুন....
নিমেষে মিলিয়ে যায় সুখ, স্বপ্ন, বর্তমান ...

পিছনে পড়ে থাকে কাদায় ডোবা ফসল,
ভাঙা দেওয়াল, হারিয়ে যাওয়া সংসার
চশমা, জুতো, জলের বোতল.....

আর?

এক চিরন্তন স্থবির সিংহাসন!





শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে

পার্থসারথির পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী বৃন্দকে জানাই

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

